অঞ্জন চক্রবর্তী

ক্ষম হে মম দীনতা

"মানুষ এত বড়ো যে সে যেমন ফলকে অবজ্ঞা করতে পারে তেমনি দৃষ্টান্তকেও। দৃষ্টান্ত হয়তো নেই, বীজের ভিতরে ফুলের দৃষ্টান্ত যেমন নেই; কিন্তু বীজের ভিতরে ফুলের বেদনা আছে। তবু, দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই? বুদ্ধ বহু শতাব্দী ধরে যে সাধনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রেখেছিলেন সে কি ফলের সাধনা?"

(ঘরে বাইরে)

দুই বন্ধু তরজায় মেতেছে। দুজনেই ভাবছে দেশ নিয়ে, কিন্তু দুরকম ভাবে। তথাকথিত শক্তির উপাসক সন্দীপ ভাবছে ফলের দৃষ্টিভঙ্গিতে, ইতিহাসে দিকবিজয়ী সেকেন্দর থেকে আমেরিকার ক্রোড়পতি রকফেলার সুস্পষ্ট ছাঁচে সফল হয়ে উঠেছে। নিখিলেশ এই ছাঁচে ঢালা সফলতায় বিশ্বাসী নয়, সে আত্মার সন্ধানী। তাই তার মতে "দেশ যেখানে বলে 'আমি আমাকেই লক্ষ্য করব' সেখানে সে ফল পেতে পারে কিন্তু আত্মাকে হারায়।" সন্দীপ এতে সন্তুষ্ট নয়, সে দৃষ্টান্ত চায়। তার প্রশ্নের মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রথমে নিখিলেশ মানুষের অসীমতাকেই গুরুত্ব দিতে চায় যা ফলের মতোই দৃষ্টান্তে আবদ্ধ নয়। তারপরে সে আনে বুদ্ধের প্রসঙ্গ, ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধের প্রভাবের কথা।

নিখিলেশের বুদ্ধবরণ তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথেরই মর্মবাণী। বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় নত রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করেছেন ভারতমানসে বুদ্ধমাহাত্ম্যের ব্যপ্তি ও গভীরতার কথা। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বুদ্ধের বিভাবের অনুষঙ্গে তিনি এনেছেন অশোকের কথা এবং অশোককে তিনি দীপ্ত করেছেন তাঁর কথা যা বরোবুদরের বুদ্ধপূজারী শিল্পচিহ্নের থেকেও মহীয়ান :

এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গনে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে। এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনোদিন দেখা দিয়েছে। সেই রাজাকে মাহাত্ম্য দান করেছেন যে গুরু তাঁকে আহ্বান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয়নি যেদিন জন্মেছিলেন ওই ভারতে।

(বুদ্ধদেব : বৈশাখী পূর্ণিমা : ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২)

'ঘরে বাইরে' সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুনে, ১৩২৩ এ প্রকাশিত হয় গ্রন্থের আকারে। বছর কুড়ি পরে ইংরেজের দৌরাত্ম্য এবং সন্দীপদের বিধার্মিকতা মিলেমিশে দেশকে ঠেলে দিয়েছে আরো ঘনঘোর তমিস্রায় যেখানে বুদ্ধই মুক্তির দিশারী, তাঁর সময়কালের থেকেও সেদিন তাঁর প্রাসঙ্গিকতা

আরো বেশি। শুধু জাতীয় মাত্রায় নয়, আন্তর্জাতিক হিংস্র বাতাবরণে বুদ্ধই রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়স্থল তথা পরিত্রাতা :

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোরকুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চরমধুনিষ্যন্দ
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

'বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ'— এই লাইনটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বুদ্ধর ভাবমূর্তির সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতায় জুড়ে ফেলা হয় আত্মদমন, সংযম, নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু বুদ্ধর প্রেমিকসত্তার তেমন চর্চা হয় না যেমনটি রবীন্দ্রনাথ করতে চেয়েছেন বারবার।

"মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ, তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু, প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা; যে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ— তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনা সংহরণের প্রণালী নয়, এতো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এতো সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম 'মেত্তিভাবনা'— মৈত্রীভাবনা।"

(ব্রহ্মবিহার, ১১ চৈত্র, ১৩১৫)

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে বুদ্ধের এই প্রেমময়তা শুধু তাঁর নিজের ধর্মচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামগ্রিক ভারতমানসের বিকাশে, এমনকি অন্য ধর্মমতগুলির পুনর্বিন্যাসেও তিনি দেখতে পান বুদ্ধের প্রেমভাবনার স্পর্শ :

"কিন্তু সেই দ্রাবিড় হইতেই যে প্রেমের ধর্মের স্রোত সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই বৈষ্ণবধর্মকেও কি এই বৌদ্ধ ধর্মই সঞ্জীবিত করিয়া তোলে নাই? আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধ মন্দিরে বৈষ্ণব দেবতা স্থান লইয়াছে, এককালে যাহা বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত তাহাই বিষ্ণুপদচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, রথযাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎসব আত্মসাৎ করিয়াছে।"

(বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ : ১৩১৮)

শুধু এই আত্তীকরণ বা 'আত্মসাৎ' হবার কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি রবীন্দ্রনাথ,

এর আগে ১৩১০ সালেই বলেছেন কেমন করে বৌদ্ধধর্মের আবেশে বিকশিত নব-হিন্দুধর্ম :

"বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতি মুহূর্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নব হিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল— মানুষের ক্ষুদ্র কাজে কর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষলীলা, অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল।"

আমাদের চকিতে মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের "বৈষ্ণব কবিতা"— "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

স্নেহপ্রীতির কথা তো গেল, কিন্তু যে কবির মন এত মধুর রসে ভরা, নর-নারীর ভালোবাসা যাঁর রচনার অন্যতম স্থল তিনি বৌদ্ধধর্মের আঙ্গিকে কোথায় পাচ্ছেন তাঁর এই বিশেষ প্রবণতার সঞ্চার? এটা ঠিকই যে মানবিক সম্পর্কের মধ্যে 'দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষলীলা'র উপলব্ধি তাঁর প্রবেশপথকে সুগম করেছে। বাকিটুকু সেরেছেন ভাবনার পরিপূরকতা দিয়ে। আবারও ফিরি 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে 'নিখিলেশের আত্মকথা'য় :

"বিমল হেসে বললে, তুমি দেখছি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না।

আমি বললুম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।"

নিখিলেশকে অনেকাংশেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধি হিসেবে ভাবেন সমালোচকরা, সেই আলোচকের ভাবনাও ভিন্ন কিছু নয়। ঠিক এই কথাই তো রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে পাই আমরা :

"আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্খা এই, আমাদের জীবন সহজ ও সরল হোক, আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য ও কল্যাণপূর্ণ হোক, আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক।"

যাইহোক, নিখিলেশরূপী রবীন্দ্রনাথ সেই জায়গাটা ধরতে পেরেছেন ঠিক যে জায়গায় বুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে প্রসারিত নন। অন্তরে যাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে মেনেছেন তাঁর এই ফাঁকটুকুর পূরক হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের লেখনী। নরনারীর সম্পর্কে যেখানে কামনা-বাসনার মোহাবেশ পার হয়ে অন্যমাত্রায় পৌঁছেছে সে কি দিব্য প্রেম তথা 'divine eros' নয়? 'অভিসার' কবিতায় সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে আহ্বান জানিয়েছেন বাসবদত্তা, উপগুপ্ত নম্রস্বরে প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছিল— এখনো আমার সময় হয় নি। যেথায় চলেছো যাও তুমি ধনী। সময় যখন আসবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে। যৌবনে উদ্ভাসিতা নগরনটীর সঙ্গকামনায় সেদিন উদ্বেল সবাই, কিন্তু সে তো কেবল ভোগ সুখের মোহ। যেদিন মারীগুটিকায় ভরে গেলো তার অঙ্গ সেদিন তাকে বিষবৎ ত্যাগ করে ছিল তারা, ফেলে এল পুরপরিখার বাইরে। সেইদিনই উপগুপ্তর সঙ্গে আবারো দেখা তার। কামনাবাসনাহীন মমতায় তাকে পরিচর্যা করতে

করতে তার কাতর প্রশ্নের উত্তরে উপগুপ্ত জানান— আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা।

'চণ্ডালিকা' গীতিনাট্যে অচ্ছুৎকন্যা প্রকৃতির হাত থেকে জলপান করে তাকে মর্যাদা দিয়েছিলেন আনন্দ— যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা। প্রেমে পাগল হয়ে তাঁকে মোহের নাগপাশে বাঁধতে চায় সে। কিন্তু পরে উপলব্ধি করে এমন মহানচিত্ত মানুষকে কামজর্জর করে পীড়িত করা ঘোর অসুন্দর কাজ। সে তার মাকে ফিরিয়ে নিতে বলে বন্ধনী জাদু। এই মুক্তিদানেই মহীয়সী হয়ে ওঠে তার প্রেম, ত্যাগে পূর্ণ হয়ে ওঠে প্রাপ্তি।

আমরা আমাদের আলোচনার মূলকেন্দ্রে রেখেছি একটু ভিন্ন কৌণিক রবীন্দ্ররচনাকে যা একই সঙ্গে ব্যর্থ ও প্রমত্ত প্রেমের কাহিনী, ত্যাগ ও ক্ষমাহীনতার কাহিনী, নিষ্ঠুরতা ও অনুশোচনার কাহিনী। এর উৎস মহাবস্তুবদান, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থে কাহিনীটিকে 'Story of Syama and Vajrasena' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বারবার নানা নামে রবীন্দ্রসৃষ্টিতে দেখা দেওয়া এই কাহিনীটির মর্ম ও ব্যাপ্তিকে আমরা এই ক্ষুদ্র পরিসরে অনুধাবন করার চেষ্টা করবো।

(২)

রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থে শ্যামা কাহিনী অবলম্বনে লিখলেন 'পরিশোধ'। বলাই বাহুল্য, কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মহাবস্তুবদান অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণের সঙ্গে সূত্রগত মিল রাখলেও রবীন্দ্রমানসের রসায়নে তা নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। রাজেন্দ্রলালের বজ্রসেন 'horse-dealer at Takshasila named Vajrasena; on his way to the fair at Varanasi, his horses were stolen, and he was severely wounded. As he slept in a deserted house in the suburbs of Varanasi, he was caught by policemen as a thief'। রবীন্দ্রকবিতা রাজকোষের চুরির খবর এবং নগরপালের যেনতেন প্রকারেণ চোর ধরে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষাপট দিয়ে শুরু হলেও বজ্রসেন সম্পর্কিত তথ্য প্রায় একইভাবে এসেছে :

নগরবাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে
বিদেশী পথিক পান্থ তক্ষশিলাবাসী;
অশ্ব বেচিবার তরে এসেছিল কাশী
দস্যুহস্তে খোওয়াইয়া নিঃস্বরিক্ত রো'ষে
ফিরিয়া চলিতেছিল আপনার দেশে
নিরাশ্বাসে। তাহারে ধরিল চোর বলি

'His manly beauty attracted the attention of Syama, the first

public woman of Varanasi'র সঙ্গে মানানসই শ্যামার প্রতিক্রিয়া :

'আহা মরি মরি
মহেন্দ্র নিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে।"

'By offering large sums of money she succeeded in inducing the executioners to set Vajrasena free, and execute the orders of the King on another, a banker's son, who was an admirer'র সঙ্গে কবিতার কাহিনী এবং মেজাজ দুই দূরত্ব তৈরি করতে শুরু করল। শ্যামার অনুরোধ ছিল সমস্ত স্বর্ণালঙ্কারের বিনিময়ে বজ্রসেনের প্রাণরক্ষার :

কহিল রক্ষীরে,
"আমার যা আছে লয়ে নির্দোষ বন্দীরে
মুক্ত করে দিয়ে যাও।"

কিন্তু বিষয়টি শুধু আর প্রহরীর আওতায় নেই :

"হৃত রাজকোষ,
বিনা কারো প্রাণপাতে নৃপতির রোষ
শান্তি মানিবে না।"

তখন অসহায় শ্যামা দুটি রাত বিলম্বের জন্য কাতর অনুরোধ জানায় প্রহরীকে :

"'শুধু দুটি রাত
বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো, এ মিনতি করি।'
'রাখিব তোমার কথা' কহিল প্রহরী।"

দুই রাত অতিক্রম করে আসে মুক্তির প্রভাত। বন্দীশালায় মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত বজ্রসেনকে মুগ্ধ, কৃতজ্ঞ, চমৎকৃত করে শ্যামা। কিন্তু কি করে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হল, তা বজ্রসেনের মতো পাঠকরাও জানতে পারে না যতক্ষণ না নৌকাযাত্রার এক ভয়ংকর মুহূর্তে উঠে আসে শ্যামার confession :

"বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।"

রাজেন্দ্রলাল বর্ণিত কাহিনীসূত্রে শ্যামার এই নিষ্ঠুরতার কাহিনী বজ্রসেনের জানা। তাই মনের থেকে ভালোবাসতে পারে না অপরাধিনী শ্যামাকে যদিও শ্যামা তার সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসতো তাকে :

The woman was devotedly attached to Vajrasena. But her inhuman conduct to the banker's son made a deep imprssion on his

mind. He could not reconcile himself to the idea of being in love with the perpetrator of such a crime.

বজ্রসেন তাই শ্যামাকে খুন করার চক্রান্ত করে :

On an occasion when they both set on a phevial excursion, Vajrasena plied her with wine, and, when she was almost senseless, smothered and drowned her. When he thought she was quite dead, he dragged her to the stops of the ghat and fled.

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই ছক কষে খুনের গল্প আসেনি। বজ্রসেনকে মুক্ত করেই শ্যামা নৌকা ভাসায় দেশান্তরে। কোনো বিশেষ এক প্রমোদভ্রমণের প্রসঙ্গ নেই। এই দেশান্তরী নৌকাযাত্রায় বজ্রসেন জানতে চায় কিভাবে সে বাঁচলো মৃত্যুর হাত থেকে। শ্যামা এড়িয়ে যায় 'সে কথা এখন নহে' বলে। যে সন্ধ্যায় শ্যামা জানাতে পারলো তার পাপবৃত্তান্ত সেদিন জ্বলে উঠলো বজ্রসেন :

"'আমার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল? এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত! কলঙ্কিনী,
ধিক্ এ নিঃশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে।'
এত বলি উঠিল সবলে। নিরুদ্দেশে
নৌকা ছাড়ি চলি গেল তীরে, অন্ধকারে
বনমাঝে।"

কিন্তু এই বনপথের ক্ষুব্ধ পদচারণের নিঃসাড় সঙ্গিনী আছে একজন। শ্যামা। সমস্ত পাপবোধ নিয়েও সে তার প্রেমাষ্পদকে ছাড়তে রাজি নয় :

'তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত,
শেষ করে দাও মোর দন্ড পুরস্কার।'

বজ্রসেনের ক্রোধ এবার সমস্ত সীমা পার হল, নিষ্ঠুর আঘাত হানলো সে যার অভিঘাত অপরূপ কাব্যসুষমায় পারিপার্শ্বে ছড়িয়ে দিলেন কবি :

"অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরু মূল সব
মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে।
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতি স্বর; তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমি পরে অসাড় পতনে।"

রাজেন্দ্রলালের সূত্রে বজ্রসেনের আকুলতা, উন্মাদনা, অনুশোচনার কোনো উল্লেখ নেই। 'পরিশোধ' কবিতায় অনুশোচনায় দগ্ধ বজ্রসেন আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় নিজেকে, তারপরই প্রেমোন্মত্ত হয়ে ওঠে বিরহদাহে :

"তৃষায় ফাটিল ছাতি, তবু স্পর্শিল না
সম্মুখের নদী হতে জল এক কণা।
দিন শেষে জ্বরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে
ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর পরে
পতঙ্গ যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায়
উগ্র আগ্রহের ভরে। হেরিল শয্যায়
একটি নূপুর আছে পড়ি। শতবার
রাখিল বক্ষেতে চাপি। ঝংকার তাহার
শতমুখ শর-সম লাগিল বধিতে
হৃদয়ের মাঝে"।

Her mother, who was at hand came to her rescue, and by great assiduity resusciated her— এ ভাবেই শ্যামার বেঁচে ওঠার কথা উল্লেখ করেছেন রাজেন্দ্রলাল। সুস্থ হয়ে ওঠার পর সে বজ্রসেনকে বার্তা পাঠায় মিলনকামনার— Syāmā's first measure, after recovery, was to find out a Bhikshuni of Takshasila, and send through her a message to Vajrasena, inviting him to her loving embrace.

'পরিশোধ' কাহিনী প্রবাহিত হয়েছে ভিন্ন খাতে, ভিন্ন মাত্রায়। বজ্রসেনের বাহ্যজ্ঞানরহিত আকুল আহ্বানে হঠাৎই এক চমকের দেখা :

'আসিয়াছি প্রিয়তম।'
চরণে পড়িল শ্যামা 'ক্ষম মোরে ক্ষম,
গেল না তো সুকঠিন এ পরাণ মম
তোমার করুণ করে'।

বজ্রসেন ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হয়ে ওঠে, তারপর আবার ফিরে যায় সেই ক্ষমাহীনতার বৃত্তে :

"মুদি দুই আঁখি
কহিল ফিরায়ে মুখ, 'যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও'।"

শ্যামা বিদায় নেয়; ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় সে অন্ধকার বনপথে। তার আসায় যেমন রূপায়িত হয়েছিল ভীষণ অসম্ভব তেমনি তার চলে যাওয়ায় বিলীন হয়ে যাওয়া ক্ষণস্বপ্নেরই রেশ।

Story of Syāmā and Vajrasena-কে উপস্থাপিত করা হয়েছে বুদ্ধের অনুগতা স্ত্রী যশোধরাকে ত্যাগ করার কারণ হিসেবে। কাহিনীর শেষে উল্লেখ করা হয়

'Buddha was that Vajrasena, and Syāmā, Yasodharā।' কোন্ পূর্ব জন্মের স্খলনের জন্য এ জন্মেও ত্যাগ করতে হবে যশোধরাকে— এমন ভাবনা বুদ্ধভক্ত রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগার কথা নয়। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ্যে কোনো উজ্জ্বল ভাবমূর্তি নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন না বুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাই যেন এই কাহিনীর বৌদ্ধ অনুষঙ্গকে সম্পূর্ণ পরিহার করে একে তীব্র কামনা, বাসনা, পাপ, অনুতাপ এবং শেষ অবধি ক্ষমাহীনতার বিয়োগান্ত নাটকে বিবর্তিত করেছেন। 'অভিসার' বা 'চন্ডালিকা'র বৌদ্ধ অনুষঙ্গ এখানে সম্পূর্ণভাবে বর্জিত। এককথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ এই বৌদ্ধ কাহিনীকে নবজন্ম দিয়েছেন তাঁর 'Crime and Punishment'র জটিলতর বৃত্তে। বুদ্ধের গায়ের এই মলিনতাটুকু যেন এমনিভাবেই সরিয়ে একে পূর্ণ মানবিক রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

কাব্যে তার কাহিনীকে রূপ দিয়েই থামলেন না রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত Broken ties and other stories গ্রন্থে Emancipation নাম দিয়ে প্রকাশিত হল পরিশোধেরই গল্পরূপ। সঙ্গী কিন্তু 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস এবং 'নিশীথে', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'মণিহারা'র মতো ছোটো গল্পের ইংরেজি রূপান্তর। অর্থাৎ দলে Emancipation একটা বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে রয়েইছে। ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে পরে ইংরেজি রূপান্তরে গল্প লেখার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া যায় না যা এই কাহিনীটির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরক্তিরই পরিচায়ক।

না, শ্যামাকাহিনী সম্পর্কে রবীন্দ্র অনুরক্তি এখানেই থামেনি। ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে 'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' অবলম্বনে একটি গীতিনাট্য রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ যা ১৯৩৬ সালের ১০ ও ১১ অক্টোবর আশুতোষ কলেজে মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু এখানেও শেষ নয়। নিজের এই সৃষ্টিকে এবার রূপ দিলেন 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে। এবারে নামকরণ একেবারে কেন্দ্রীয় চরিত্র 'শ্যামা'র নাম অবলম্বনেই। শুধু নামকরণে নয়, 'পরিশোধ'ও 'শ্যামা'র কাহিনী ও বিন্যাসে বেশ কিছু ফারাক দেখা যায়, যেমন ফারাক ছিলো 'পরিশোধ' কবিতা ও গীতিনাট্যে। 'পরিশোধ' গীতিনাট্যে বজ্রসেনকে অন্যায়ভাবে বন্দী করার বিষয়টি বিশ্বজনীন অন্যায়-উৎপীড়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সহচরীর কণ্ঠে :

"সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
ঘুচাবে কে;
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে
মুছাবে কে।
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।"

দেশে ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচার, দেশের বাইরেও বলদর্পীর অন্যায় পীড়নে ব্যথিত রবীন্দ্রচিত্ত বজ্রসেনের অন্যায় বন্দীত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে

প্রেক্ষাপটকে আরো বিস্তৃত করেছে।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বদল এলো কাহিনীর শেষে। 'পরিশোধ' কবিতার শেষে পুনর্বার দেখা দেওয়া শ্যামাকে গ্রহণ করতে পারেনি বজ্রসেন। শ্যামাকে মর্মান্তিক আঘাত করার পর তার অনুশোচনা, আত্মপীড়ন, শ্যামাবিরহের যন্ত্রণা তাকে চূড়ান্তভাবে উন্নীত করতে পারেনি ক্ষমার প্রসারণশীলতায়। শ্যামা প্রত্যাখ্যাতা হয়ে ফিরে গেছে। 'পরিশোধ' গীতিনাট্যের অন্তিমলগ্নে প্রত্যাখ্যানের পর বজ্রসেন যেন নিজের মন কে নতুন তারে বাঁধতে চায়, দূষিত নিষ্ঠুর স্বপ্নের মতো শ্যামার সঙ্গে তার প্রণয়কথাকে ভুলে সে আত্মশুদ্ধি চায় দুঃখের তপস্যায় :

"অশুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে
নিদারুণ বিষ,
লোভ না রাখি
প্রেতবাস তোর ভগ্ন মন্দিরে।।
নির্মম বিচ্ছেদ সাধনায়
পাপস্খালন হোক,
না করো মিথ্যা শোক,
দুঃখের তপস্বী রে,
স্মৃতিশৃঙ্খল করো ছিন্ন,
আয় বাহিরে
আয় বাহিরে।"

এরপর ধ্বনিত হয়েছে নেপথ্যকণ্ঠে শ্যামা ও বজ্রসেন উভয়ের জন্যই উপদেশ, যা ঘটে গেছে তা থেকে কিভাবে উন্নীত হওয়া যায় কামনা কুহেলিকে বিসর্জন দিয়ে তার নির্দেশিকা ব্যক্ত হয়েছে :

"কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে,
যাও চিরবিরহের সাধনায়,
ফিরো না, ফিরো না, ভুলো না মোহে।
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
জয়ী হও অন্তর বিদ্রোহে।
যাক পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা,
যাক মিলায়ে কামনা-কুয়াশা।
স্বপ্ন-আবেশহীন পথে
যাও বাঁধন-হারা
তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে বহে।"

বলাই বাহুল্য, কামনা জর্জর, অধিকারবাদী প্রেমের অসম্পূর্ণতা জয় করতে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন বুদ্ধ প্রদর্শিত পথেরই সারাৎসার। তাঁর নিজস্ব সংযোজন বিরহের সাধনা যা বাসনার ক্লেদ থেকে মুক্ত করে শুদ্ধ করে তোলে অসম্পূর্ণ প্রেমিকচিত্তকে।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের শুরুতেই পরিবর্তন। রাজকোষ থেকে চুরির জন্য যেনতেনপ্রকারেণ একটি চোর জোগাড় করতে হবে— এই সূত্রপাতের বদলে পেলাম বজ্রসেন ও তার বন্ধুর তাৎপর্যপূর্ণ কথোপকথন। বজ্রসেনের কাছে আছে সুবর্ণদ্বীপ থেকে আনা ইন্দ্রমণির হার, স্বয়ং রাজমহিষীর কানে সে খবর পৌঁছে গেছে। বন্ধু চায় সেই হার নিয়ে রাজবাড়িতে বেচে দিতে। তাতে বেঁচে যাবে বজ্রসেন কারণ তার পিছনে লেগে আছে রাজার চর। বজ্রসেন কিন্তু এই হার নিয়ে বাণিজ্য করতে রাজি নয়। সে এই হার তুলে রেখেছে এমন কারোর জন্য যার সঙ্গে রচিত হবে তার হৃদয়ের সম্পর্ক, লেনদেন সেখানে অর্থহীন হয়ে যাবে। অতঃপর কোটালের আবির্ভাব, সে বজ্রসেনের পেটিকার তল্লাশ করতে চায়। বজ্রসেন পালায়, কিন্তু পরে চুরির মিথ্যা অপবাদে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় তাকে।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন উত্তীয়র প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। 'পরিশোধ' কবিতায় ও গীতিনাট্যে সে শুধু উল্লেখিত যদিও তার আত্মদানকে কেন্দ্র করেই ঘনীভূত হয়েছে কাহিনীর ট্র্যাজেডি। একই ঘটনা ঘটেছে Emancipation-এও। ১৯৩৪ সালে 'শ্যামা'র অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামা'র একটি সংক্ষিপ্ত নাট্যপরিচয় রচনা করেন যা প্রচারপুস্তিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এই নাট্যপরিচয়ের দ্বিতীয় দৃশ্যর নাম 'শ্যামার সভা', এই দৃশ্যেই উত্তীয়র প্রত্যক্ষ ভূমিকা আমরা পাই, পাই তার চরিত্রের পূর্ণতর প্রকাশ যা এতদিন শুধু উল্লেখিত ছিল :

শ্যামা রাজনটী, বিখ্যাত সুন্দরী; তার প্রেমে পাগল বালক উত্তীয়। সে শ্যামার পূজা করে দূরের থেকে। সখীদের করুণা তার পরে। শ্যামা নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত, এমন সময়ে চোর অপবাদ দিয়ে প্রহরী শ্যামার সভার মধ্য দিয়ে বজ্রসেনের পিছন পিছন ছুটে গেল। শ্যামা বজ্রসেনের দেবকান্ত মূর্তি দেখে মুগ্ধ। সখীকে পাঠিয়ে বজ্রসেনের সঙ্গে প্রহরীকে ডেকে পাঠালে। বজ্রসেনকে বাঁচাবার জন্যে দুদিন সময় চাইলে। প্রহরী রাজি হল। শ্যামা সভাস্থদের উদ্দেশ্য করে বললে, "তোমাদের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে এই নিরপরাধ বিদেশীকে অন্যায় অপবাদ থেকে রক্ষা করবে।" উত্তীয় এসে বললে, "ন্যায়-অন্যায় বুঝি নে, এ বিদেশীর নামের অভিযোগ আমি নিজে স্বীকার করে প্রাণ দেব— সেই মৃত্যুর বন্ধনেই তোমার সাথে আমার মিলন হবে।" প্রহরীর কাছে সে আত্মসমর্পণ করলে। কারাগারে তার মৃত্যু হল।

'প্রেমে পাগল' উত্তীয়— এ কথা আমরা আগেও শুনেছি, Emancipation-এও তাকে বলা হয়েছে 'Love sick'। কিন্তু দূর থেকে শ্যামার পূজা করার মধ্যে রাবীন্দ্রিক মাধুর্যের এক বিরল ছোঁয়া রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেম ও পূজা একাকার— দেবতারে প্রিয় করি/প্রিয়রে দেবতা (বৈষ্ণব কবিতা)। মৃত্যুর মধ্যে সে মিলনের যে আশ্চর্য সুন্দর ভাবনা সে ভেবেছিল তা কামনাবাসনাহীন প্রেমের চরম উৎকর্ষতাই প্রকাশ করে। তাই সখীরা যখন তার প্রেমের ব্যর্থতায় সহানুভূতিশীল হয়, উৎসাহ দিতে গেয়ে ওঠে "হতাশ হোয়ো না, হোয়ো না, /হোয়ো না, সখা/নিজেরে ভুলায়ে লোয়ো না, লোয়ো না/আঁধার গুহাতলে" তখন এই প্রেমপূজারী ব্যক্ত করে চলে তার দাবিহীন ব্রত :

"চমকিবে ফাগুনের পবনে,
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে,
চিত্ত আকুল হবে অনুখন
অকারণ।
দূর হতে আমি তারে সাধিব,
গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব।
বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন
অকারণ।"

আত্মত্যাগে উদ্যত উত্তীয়র সামনে সকৃতজ্ঞ, কুণ্ঠিত, ব্যথিত শ্যামার হৃদয়, উত্তীয় তাকে জানায় সে যা পেয়েছে তার তুলনা সেই। এ দান নিঃশব্দ, উপলব্ধিতে একে মাপা যায় না :

"আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ।"

'পরিমাণ' শব্দটা এই নাটকের বণিকপ্রবল পরিমণ্ডলে এক নতুন অভিধার সৃষ্টি করে। এ মূল্য পরিমাণযোগ্য নয় বলেই এর ব্যাখ্যাও কাব্যিক, নিক্তিতে মাপা নয় :

"রজনীগন্ধা অগোচরে
যেমন রজনী স্বপন ভরে
সৌরভে,
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।"

আত্মোৎসর্গে মহৎ হলেও উত্তীয়ের এই আত্মত্যাগ মেনে নিতে পারে না সখীরা। নাটকে তাদের কণ্ঠ অনেকাংশেই ন্যায় ও বাস্তবতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই এই মৃত্যু যে শ্যামা-বজ্রসেনের মিলনশয্যা তৈরি করতে পারবে না তার পূর্বাভাস তাদের কণ্ঠেই প্রকাশ পায় :

"তোমার প্রেমের বীর্যে
তোমার প্রবল প্রাণ সখীরে করিলে দান।
তব মরণের ডোরে
বাঁধিলে বাঁধিলে ওরে
অসীম পাপে
অনন্ত শাপে।
তোমার চরম অর্ঘ্য
কিনিল সখীর লাগি নারকী প্রেমের স্বর্গ।"

'পরিশোধ' গীতিনাট্য ও 'শ্যামা'র কাহিনীর আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য এর অন্তিমপর্বে। 'পরিশোধ' কবিতার বজ্রসেনের প্রত্যাখ্যানের পরে শ্যামার অন্ধকারে

বিলীন হবার পরিণতি পাল্টে 'পরিশোধ' গীতিনাট্যে এসেছিল বিরহজ্বালায় পাপকে অতিক্রম করার তপস্যা যার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। 'শ্যামা'র পরিণতিতে কোনো পথের দিশা ধ্বনিত হয় নি, আবার শ্যামার মিলিয়ে যাওয়ায় শেষ হয়নি কাহিনী। 'পরিশোধ' গীতিনাট্যে শ্যামার পুনরায় আবির্ভাবের আগে আকুল ও অনুতপ্ত বজ্রসেনের কণ্ঠে ব্যবহৃত হয়েছে 'ক্ষমিতে পারিলাম না যে' গানটি, 'শ্যামা'র সমাপ্তি ঘটেছে এই গানটির মাধ্যমেই :

"জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।"

বজ্রসেনের জন্য কোনো redemption-র আভাস এই পরিণতিতে নেই যা 'পরিশোধ' গীতিনাট্যে রয়েছে। অন্যদিকে শ্যামার মানবী মূর্তি 'শ্যামা' কাহিনীতে বিস্তৃততর। শুধু উত্তীয়কে অঙ্গুরীয়প্রদান বা তার সঙ্গে করুণায় আর্দ্র কথা বলা নয়, শ্যামা বধ্যভূমিতে ছুটে যায় শেষ মুহূর্তে উত্তীয়কে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

(৩)

"আমার শ্যামা নাটকের জন্যে একটা গান তৈরি করেছি, ভৈরবী রাগিনীতে— জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা / হে গরবিনী। এই গরবিনীরে সংসারে দেখেছি বারংবার, কিন্তু গানের সুর শুনলে বুঝবে, এই বারংবারের অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন্ চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে।"

(অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি। প্রবাসীতে প্রকাশিত। চিঠির তারিখ ১৪/২/৩৯)

গানের সুর প্রত্যক্ষকে কোন্ সুদূরে পৌঁছে দিতে পারে সে কথাই বলছেন কবি। আমাদের এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের আগ্রহ চিঠির বক্তব্য উপস্থাপনা করতে গিয়ে যে প্রবণতাগুলি বেরিয়ে এসেছে কবির অন্তরমহল থেকে, সে গুলি নিয়েই। কবি সংসারে দেখা কোন্ গরবিনীকে গানের ওপারে পাঠিয়ে তাঁর পায়ের কাছে মুগ্ধ চিত্তে বসতে পারেন? রবীন্দ্র জীবন ও কাব্যের রসিক পাঠকের এ বিষয়ে ভুল হওয়ার কথা নয়। এ নারী 'জীবনের ধ্রুবতারা', 'কবির অন্তরে তুমি কবি' কাদম্বরী, যাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য জাক মারিতাঁ থেকে দান্তের জীবনে বিয়াত্রিচের প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন কবিমানসী ২য় খণ্ডের "কাদম্বরী : ধ্রুবতারা" অংশে— She is both herself and what she signifies। সংসারে দেখা গরবিনী যদি কাদম্বরী (herself) হন তবে চিরকালের

গরবিনী 'What she signifies'।

'শ্যামা' গীতিনাট্য রচনার খুব কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন স্মৃতির উজান বাওয়া কিশোরবেলার মৃদু, অস্ফুট অনুরাগে রঞ্জিত 'আকাশপ্রদীপ'। আকাশপ্রদীপ প্রিয়জনের সম্মানেই জ্বালানো হয়, যে প্রিয়জন হারিয়ে গেছেন অনেক দূরে। 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যর 'আকাশপ্রদীপ' (২৪.৯.৩৮), 'শ্যামা' (৩১.১০.৩৮), 'জানা-অজানা' (১১.৯.৩৮), 'কাঁচা আম' (৮.৪.৩৯), কবিতা থেকে বৌঠানের প্রিয়স্মৃতির আভাস নিয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য আলোচনা করেছেন কবিমানসী ১র 'সৃষ্টির শেষ রহস্য-ভালোবাসার অমৃত' অধ্যায়ে। 'পরিশোধ' নাম পাল্টিয়ে 'শ্যামা' হচ্ছে, আবার বৌঠানের অনুষঙ্গ নিয়ে কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামা' কবিতা লিখছেন— এ দুটি বিষয় নিছক কাকতালীয় হতে পারে না। বালক উত্তীয় পূজো করে শ্যামাকে। সে কি বৌঠানের গুণ ও রূপমুগ্ধ কিশোর রবি নয়? উত্তীয় বলে 'দূর হতে আমি তারি সাধিব', বৃদ্ধ কবি কিশোর রবির মধ্যে ঢুকে পড়ে লেখেন :

ও যে দূরে, ও যে বহু দূরে,
যত দূরে শিরীষের উর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণগন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।
(শ্যামা)।

এই 'গন্ধ'র তাৎপর্য সত্যিই সুদূর প্রসারী। উত্তীয় তার বিদায়বেলার গানে বলেছিল— রজনীগন্ধা অগোচরে / যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে। রজনীগন্ধার সঙ্গে কাদম্বরীর অনুষঙ্গ খুঁজতে আমরা চলে আসি তাঁর আত্মহননের পর লেখা রবীন্দ্রনাথের 'পুষ্পাঞ্জলি'তে :

"তুমি যে ঘরটিতে রোজ সকালে বসিতে তাহারই দ্বারে স্বহস্তে যে রজনীগন্ধার গাছ রোপণ করিয়াছিলে তাহা কি আর তোমার মনে আছে! তুমি যখন ছিলে তখন তাহাতে এত ফুল ফুটিত না, আজ সে কত ফুল ফুটাইয়া প্রতিদিন প্রভাতে তোমার সেই শূণ্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে।"

'তুমি রবে নীরবে' গানটিতেও তো রবীন্দ্রনাথ লিখলেন— মম দুঃখবেদন / মম সফল স্বপন / তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী-সম।

শ্যামা বিদায়ক্ষণে উত্তীয়কে দিয়েছিল অঙ্গুরীয়। আকাশপ্রদীপের 'কাঁচা আম' কবিতায় আমরা দেখি স্বয়ং বালক রবির বৌঠানের কাছ থেকে আংটি পাওয়ার ঘটনা :

"বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে;
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে—
খুঁজে পাইনি।"

ব্যাপারটি যে নিছক বানানো কাব্যিকতা নয়, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ জগদীশ ভট্টাচার্য মৈত্রেয়ী দেবীকে বলা কথা উদ্ধৃত করেছেন :

"একবার মাত্র জীবনে গয়না পরেছিলুম, আংটি। নতুন-বৌঠান দিয়েছিলেন, গাজিপুরে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে জলে পড়ে গেল, খুব দুঃখ হয়েছিল।"

(মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রেয়ী দেবী)

সংক্ষিপ্ত নাট্য পরিচয়ের দ্বিতীয় দৃশ্যর নাম 'শ্যামার সভা'। ভারতী গোষ্ঠীর যে সভা আয়োজিত হত তেতলার ছাদে তাকে কাদম্বরীর সভা বললেও অত্যুক্তি হয়না। জগদীশ ভট্টাচার্য 'ভারতী-মধুচক্রের মক্ষিরাণী' হিসেবে উল্লেখ করেছেন কাদম্বরীকে। শরৎকুমারী 'ভারতীর ভিটায়' নামক রচনায় লিখছেন— "ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন।" অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রীর মন্তব্যের পাশাপাশি জগদীশ ভট্টাচার্য উদ্ধৃত করেছেন খোদ ঠাকুরবাড়ীর অবন ঠাকুরকে— নতুন কাকিমা অর্থাৎ জ্যোতিকার স্ত্রী ছিলেন বৈঠকের কর্ত্রী।

এই সভার কথা মাথায় রেখেই হয়ত পূজারী রবীন্দ্রনাথ লেখেন— আমি আছি তোমার সভার দুয়ার দেশে।

'কবিমানসী' সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় জগদীশ ভট্টাচার্যকে পত্রযোগে জানান যে রবীন্দ্রনাথের জন্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংসার বরবাদ হওয়ার রটনা তিনি অল্প বয়সেই শুনেছেন। বলাই বাহুল্য, এ রটনা রবীন্দ্রনাথের কানেও গেছিল। 'বোষ্টমী' গল্পে শহর পেরিয়ে গ্রামে যে কলংকের কথার উড়ে আসার যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে হয়তো তা এই রটনারই একরকমের প্রতিক্রিয়া। বৌঠানের প্রতি তার প্রেমানুরাগের কথা যেমন একেবারে 'দুয়ে দুয়ে চার' করে বলে দেননি রবীন্দ্রনাথ তেমনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো 'অ্যালিবাই'ও খাড়া করেন নি। কিন্তু তাঁর রচনায় অতিসূক্ষ্মভাবে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর অমলিনতার বার্তা। কখনো তা 'নষ্টনীড়' গল্পে অমলের দূরে চলে যাওয়ায়, কখনো তা 'রক্তকরবী'র বিশুর নন্দিনীকে পাবার বাজির লড়াই থেকে সরিয়ে নেওয়ায়, কখনো তা 'ভানুসিংহর পদাবলী'র ভানুর রাধার প্রতি নিজের প্রেম লুকিয়ে রেখে রাধা-কৃষ্ণর মিলনকামনায় অবহেলিতা রাধার মৃত্যুমুখী ভাবনাকে তিরস্কারে। উত্তীয়র আত্মবলিদানও এই ভাবনাকেই একটু ভিন্নতারে বাজানো সুর। রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরী-জ্যোতিরিন্দ্র কাহিনীকে খাপে খাপে শ্যামার কাহিনীর সঙ্গে মেলানো যায় না, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে 'পুলিস রিপোর্টের মতো' বাস্তবজীবন থেকে উঠে আসা সৃষ্টিকে সাজাতে রাজি নন তা অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ওই চিঠিতেই পরে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘর যেমন ভাঙেনি, রবীন্দ্রনাথের আত্মবিসর্জনে টিকেও যায় নি সেই সম্পর্ক, পৌঁছেছে ভয়ংকর পরিণতিতে। উত্তীয়র আত্মত্যাগও শ্যামা আর বজ্রসেনকে মেলাতে পারে নি, সেখানেও আরেক রকমের ভয়ংকর পরিণতি। মিল এই মূলবস্তুতে, মিল সাংকেতিকতায় যার অনেকগুলিই আমরা আলোচনায় এনেছি। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেতের প্রসঙ্গ টেনে শেষ করবো। কাদম্বরীকে সকৌতুকে 'হেকেটি' বলে ডাকা হতো, Hecate পুরাণ অনুযায়ী infernal

Goddess যাঁর সঙ্গে জড়িত চন্দ্রমা। 'পরিশোধ' কবিতায় শ্যামা যখন বজ্রসেনের কাছে উত্তীয়র আত্মহননের কথা জানায় তার ঠিক পরের পরিবেশগত বর্ণনার দিকে তাকানো যাক :

"ক্ষীণচন্দ্র অস্ত গেল। অরণ্য নীরব
শতশত বিহঙ্গের সুপ্তি বহি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ।"

যখন বজ্রসেন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানবে শ্যামাকে তখনো চাঁদ নেই। সেই সঙ্গে যেন নিভে গেছে সমস্ত মহাজাগতিক আলো :

"অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা।"

নীরজার মৃত্যুদৃশ্যে আবহর চন্দ্রহীন বাস্তবতা কিভাবে সাংকেতিক তাৎপর্যে ভরে উঠেছে তা 'রবীন্দ্রনাথের মালঞ্চ : মৃত্যুর ছায়া জীবনের দাবি' গ্রন্থের 'হেকেটির পদপাত' অংশে আলোচনা করেছিলাম।

যা ছিল বৌদ্ধ কাহিনী, বুদ্ধের কোনো এক জন্মের তমসাবৃত কাহিনী, তাকে রবীন্দ্রনাথ টেনে আনলেন তাঁর নিজের জীবনের কলংকবৃত্তে। এ শুধু তাঁর ফলিত বৌদ্ধচর্চা নয়, যাঁকে অন্তরের থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব জেনেছেন তাঁকে নিজের যন্ত্রণায় ধারণ করা। এভাবেই মিলেমিশে গেলেন শাশ্বত ভারতের দুই মহাপ্রাণ।